ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ

আকাশ মালিক

(২)

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

ফিরোজ আবু লুলু এক দিন ওমরকে (রাঃ) নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। এর তিন দিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পর দিন ওমরের (রাঃ) ছেলে ওবায়দুল্লাহ, প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান, ও হজরত সা'দের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও জুফাইনকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়ীতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। ওমরের (রাঃ) হত্যায় এরা কেউই জড়িত ছিলেন না, তবে তারা ফিরোজের পরিচিত ছিলেন। বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামী আইনের সুবিচার দেখবে। খলিফা উসমানের মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরআন-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলী (রাঃ) সহ বেশ ক'জন শরীয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবী। গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণ একমত যে, হজরত ওমরের পুত্র ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যুদন্ড হবে। কারণ, নিহিত তিন ব্যক্তির একজন হরমুজান ছিলেন মুসলমান । শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবীর ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে ওমরের (রাঃ) খুন সম্মন্ধে কিছুই জানে না। হজরত আলী (রাঃ) অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ও তাঁর মতো, হজরত ওমরের তৈরী কয়েকজন নামকরা ঘাতক সন্ত্রাসী দাঁড়িয়ে হজরত আলীর (রাঃ) দেয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) কোরআন-হাদিস, শরিয়া আইন ও বিশ্ব-বিবেককে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, হজরত ওবায়দুল্লাহকে দন্ডমুক্ত করে দিলেন। ওমরের (রাঃ) আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশী হলেন, দুঃখিত হলো মদীনাবাসী। মদীনার মুসলিম কবি যিয়াদ ইবনে লবিদ, খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন। লোকে প্রকাশ্যে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন।

কিছুদিন পরেই মদীনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শুন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলে না। সব চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হলো মদীনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবি। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতো না। গণিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতো না। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কা'বা ঘরের সেবা-যত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর সহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত। মেষ পালক, পুরোহিত থেকে রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় সপ্নের মতই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো।

মদীনা থেকে উসমানের (রাঃ) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিটি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্ণরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানো তো দূরের কথা, তারা ইসলামী শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষনা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার, মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) উসমানের (রাঃ) চিটির উত্তরে লিখলেন- 'উষ্ট্রী এর বেশী দুধ দিতে অপারগ।' ইনিই সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) যিনি ওমরের (রাঃ) খুনি পুত্র ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দেয়ার জন্য উসমানকে (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন। খলিফা ভীষন রাগান্বিত হলেন। তিনি আমর ইবনুল আ'সকে (রাঃ) পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পোর্ট সাঈদের সামরীক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্কে সমগ্র মিশরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ সম্পর্কে একটি ঘঠনার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এক কালের শুভাকাঙ্খীদের তালিকা তৈরী করলেন। তাদেরকে হত্যা করা হবে। মোহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর ধর্মকে মিথ্যা প্রমানিত করে ফেলবে। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ মোহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরআন সম্পাদনা করতেন। মোহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘঠনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘঠনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) তখন প্রতিবাদ করতেন এবং মনে মনে এই বলে সন্দেহ করতেন- তাহলে কি ওগুলো জিব্রাইল মারফত আল্লাহ্র পাঠানো স্বর্গীয় বাণী নয়। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের (রাঃ) কপাল ভাল, হজরত উসমান বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ হজরত উসমানের (রাঃ) দুধ ভাই (Foster brother) ছিলেন। উসমান মোহাম্মদের কাছে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মোহাম্মদের ওর্ডার পেয়ে ঘাতক শানিত তরবারী হস্তে শিরোপরে দন্ডায়মান ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ের স্বামী জামাতা উসমানের (রাঃ) অনুরুধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) প্রান ভিক্ষা পেলেন। এখানে হজরত আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) পরিচিতি জেনে নিলে পরবর্তি ঘঠনা বুঝতে সুবিধা হবে।

হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বল্লো, আবু বকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবে না। ওমর (রাঃ) বল্লেন, খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও বিচক্ষন শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। ওমর (রাঃ) খুশী হয়ে তাঁকে মিশর দখল করার দায়ীত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) প্রমান করে দিলেন যে, তিনি খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তিনি খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিটি লিখলেন-

‘আমীরুল মোমেনীন, আজ আমি এমন একটি জাতীকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারে না। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে যেখানে এসে গ্রীক-রাজপুতগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিত। এই নগরীর এক-প্রান্তে সু-প্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সু-প্রসিদ্ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্তে বিখ্যাত সিজারীর মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।’

চিটি পেয়ে ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশী হলেন। চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরী বিশ সনে। গ্রীকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলো না। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন। পাঁচ বৎসর পর হিজরী পঁচিশ সনের কথা। ইতিমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রীক সম্রাট কনষ্টানটাইন, এক বৎসরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেন নি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসন মুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান (রাঃ)। বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আ’সের (রাঃ) শরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনুরুদ্ধারের অনুরুধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান (রাঃ) বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আ’সকে (রাঃ) মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগ দিয়ে দেন। মিশরে আবদুল্লাহ্ বিন সা’দ বিন আবু সারাহ (রাঃ) ও আমর ইবনুল আ’সের (রাঃ) দ্বৈত শাসন চল্লো। এই দুই সাহাবী একে অপরের চক্ষুশুল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা একে অপরের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী নির্দেশ জারী করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্ত দায়ীত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান (রাঃ)। আবদুল্লাহ্ বিন সা’দের অভিযোগ- *আমর ইবনুল আ’স (রাঃ) গ্রীকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারন মানুষের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রীক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রেখে দিয়েছেন এবং জনগনের কাছ থেকে জোরপুর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন।* পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আ’সের (রাঃ) অভিযোগ- *আবদুল্লাহ্ বিন সা’দ (রাঃ) ঔদ্ধত্যপুর্ণ, রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। ইনি নবীজীর অভিশপ্ত লোক এবং কোরআন আল্লাহ্র বাণী বলে বিশ্বাস করেন না।* আবদুল্লাহ্ বিন সা’দের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্মন্ধে সম্ভবত উসমানের (রাঃ) চেয়ে বেশী কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর দুধ ভাইকে তিন দিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মোহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) বিচারে আমর ইবনুল আ’সকে (রাঃ) দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবার বহিস্কার করে উসমান (রাঃ) যেন সর্পের গুহায় হাত দিলেন। আমর ইবনুল আ’স খলিফা উসমানের (রাঃ) স্বজন-প্রীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মত গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদীনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধের পালা। আমর ইবনুল আ’সের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

মাত্র এক বৎসর হলো উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় বসেছেন। এরই মধ্যে এক দিকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিরোধ, অঙ্গরাজ্যের গভর্ণারদের ট্যাক্স প্রেরণে অনিয়মিতা, হাশিমী ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা, এবং সর্বোপরি মদীনায় খাদ্যাভাবে খলিফা ভীষণ চিন্তিত হলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন সিরিয়ার গভর্ণর হজরত মোয়াবিয়া (রাঃ)। পরামর্শ দিলেন আর্মানীয়া ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা এশিয়া মাইনর আক্রমন করতে হবে। উসমান (রাঃ) ক্ষমতায় আরো কিছুদিন থাকার ভরসা পেলেন, অন্তত আয়ের একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। হজরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) কথামত উসমান (রাঃ) কুফার সালমান বিন রুবাইয়াকে আট হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন। আর্মানিয়ার পথে সেনাপতি সালমান (রাঃ) তাঁর দল নিয়ে সিরিয়া বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পারস্য ও গ্রীসের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চল আর্মানিয়া, চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির দৃষ্টিগোচরে ছিল। আর্মানিয়ার স্বাধীনচেতা অধিবাসীদের কেউই বেশীদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। এ দেশ পারস্য ও গ্রীস কর্তৃক বহুবার অধিকৃত হয়েছে। হজরত ওমরের (রাঃ) মুসলিম বাহিনী যখন গ্রীকদের হাত থেকে অঞ্চলটি দখল করে, তখনও আর্মানিয়ানগণ জানতো, এ অধীনতা সাময়ীক। উসমানের (রাঃ) সময়ে তারা মদীনায় ট্যাক্স পাঠানো বন্ধ করে দিল। হিজরী পঁচিশ সনের শেষের দিকে সিরিয়া ও ইরাকের সম্মিলিত বিরাট মুসলিম সেনাবাহিনী আর্মানিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে তার আভ্যম্তরীন মালভূমি এলাকায় এসে উপনীত হয়। ওমরের (রাঃ) মৃত্যুর পর মাত্র কিছুটা দিন আর্মানিয়ানগণ শান্তিতে ছিল। আবার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পাহাড়ী অঞ্চল। স্বাধীনচেতা আর্মানিয়ানগণ দেশমাতৃকার জন্যে অকাতরে জীবন দিতে পাহাড় বেয়ে নেমে আসলো । এক হাজার দিনের ক্ষুধার্ত সিংহের মতো তাঁদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো মুসলিম সৈন্যগণ। লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আরবীয় তেজস্বী তলোয়ারের নীচে গলা পেতে দিল সহস্রাধিক তাজা প্রাণ। পাহাড়ের শ্বেতবর্ণের ঝর্ণারাশি রঙ্গীন হলো আর্মানিয়ানদের রক্তের স্রোতধারায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুন হারে কর দেবার শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো। আর্মানিয়া দখল করে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বদেশে ফিরে গেলেন না। তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ পুরোদমে চালিয়ে গেলেন। বিজয়ানন্দে উৎফুল্ল মুসলমানগণ অতি সহজেই আর্মানিয়ার পশ্চিম দিকে তিফলিশ নগরী দখল করে কৃষ্ণ সাগর তীরে এসে পৌছিল। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ভুমধ্যসাগরের পূর্ব উপকুলে লেভান্ট শহর। এখানে গ্রীকদের সাথে তাদের তুমল যুদ্ধ হলো। মুসলিম সৈন্যদের গতিরোধ করার মত শক্তি সম্ভবত তখনকার পৃথিবীতে কারো ছিলনা। সুতরাং তারা এখানেও জয়ী হলেন। দেশের পর দেশের, যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কৃষ্টি ও সনাতন সভ্যতা ধ্বংস করে মুসলমানগণ আত্মতৃপ্তি বোধ করলো। কিন্তু কাস্পিয়ান থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি, আরব জাতির প্রতি রোষায়িত হয়ে উঠলো। হজরত ওমরের আমলের দখলকৃত কিছু কিছু এলাকায় তাঁর জীবিত থাকা কালেই বিদ্রোহ চলছিল। তম্মধ্যে পারস্যের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওমরের (রাঃ) যুগের পলাতক পারস্য সম্রাট ইয়াযদ্গার্দ, উসমানের (রাঃ) শাসনকালে মুসলমানদের হাত থেকে স্বদেশ পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। অষ্টআশি বৎসর বয়স্কা ইয়াযদ্গার্দকে সিংহ-রূপী মুসলমানদের সম্মুখ হতে মুষিক ছানার মত

পালিয়ে খোরাসানে আশ্রয় নিতে হলো। খোরাসান ছিল পারস্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এলাকা। হজরত উসমান (রাঃ) ঘোষনা দিলেন, যে খোরাসানে আগে প্রবেশ করতে পারবে, সে-ই হবে তথাকার শাসনকর্তা। সুতরাং মুসলিম বাহিনী এলাকাটি দখল করে নিতে আর দেরী করলেন না। এ ছিল ছয়শত একান্ন খৃষ্টাব্দের ঘঠনা।

ভূমধ্য সাগর, পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিন আফ্রিকার উপকুলভাগ বিধৌত করায়, সাগরবক্ষ হতে উল্লিখিত দুই মহাদেশের উপকুলবর্তি জনপদসমুহের ওপর আক্রমন করার সপ্ন হজরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) রাত দিন তাড়া করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব মেডিটারেনিয়ান এলাকায় অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপটি দখলের অভিপ্রায় তাঁর বহুদিনের। হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস, পাকিস্তান (তখনকার সময়ের ভারতবর্ষ) ও ভারতের কিছু সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) পরামর্শে মুয়াবিয়ার (রাঃ) প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। খলিফা উসমানের (রাঃ) কাছে মুয়াবিয়া (রাঃ) আবার সাইপ্রাস দ্বীপ দখলের প্রস্তাব পাঠালেন। জলযুদ্ধে মুসলিমদের অদক্ষতার কথা স্মরণ করে খলিফা সংকিত হলেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার (রাঃ) সাইপ্রাস দখলের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। যুদ্ধের অনুমতি দিলেন সত্য, তবে একটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। উসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন, বিগত অনেক যুদ্ধে বিভিন্ন এলাকার অমুসলিম, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কিছুকিছু লোক শুধুমাত্র যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহন করে। তাঁর বিশ্বাস এরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে একদিন ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করবে। খলিফার এই বিশ্বাস মোঠেই অমূলক ছিল না। ইসলামের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসেরই জন্ম দিয়েছিল যে, যুদ্ধই জিবীকা নির্বাহের একমাত্র উপায়।

অনুমতি পেয়ে হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সারা দেশে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সৈনিক আহ্বান করলেন। জলযুদ্ধের ট্রেইনিং শুরু হলো। রাজধানীতে মানুষের দলেদলে সৈনিকের খাতায় নাম লিখানোর তোড়জোড় পড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে উঠলো। আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস আল্ হারেসীর নেতৃত্বে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, হিজরী আটাইশ সনে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাস উপকুলে এসে পৌছে। গ্রীক নৌ-বাহিনীর সাথে পরদিন শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথম দিনের যুদ্ধেই মুসলিম সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস (রাঃ) তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হলেন। খবর পেয়ে মদীনায় খলিফা চিন্তিত হলেন। তাড়াতাড়ি মিশরের গভর্ণর আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) সাইপ্রাস অভিমুখে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। মিশর থেকে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ সৈন্য নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত মুলিম বাহিনী আত্মরক্ষামুলক যুদ্ধ চালিয়ে গেল। অল্পদিন পরে মিশর ও সিরিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমনে গ্রীক বাহিনী পরাজয় বরণ করে। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মুয়াবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস অধিবাসীগণের ওপর জিজিয়া কর ধার্য না করে রাষ্ট্রের ওপর বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ট্যাক্স আরোপ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেন। মুয়াবিয়ার পরামর্শে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ নৌ-বহর বোঝাই করে যুদ্ধলব্ধ মাল নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ বিন- কায়েস (রাঃ) অন্য একটি যুদ্ধে মারা যান। জীবিত কালে আব্দুল্লাহ্

বিন- কায়েস (রাঃ) কমপক্ষে ৫০টি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন। রাজ্য বিস্তারের সাথেসাথে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যুদ্ধলব্ধ বাড়তি সম্পদও আসতে থাকলো। কিন্তু এই লুটের সম্পদ দেশের উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যবহার হলো না। ক্ষমতা ও সম্পদ দুটোই রইলো কোরায়েশদের হাতে। দিন দিন শাসক ও শোসকের মধ্যকার বৈষম্য বাড়তেই থাকলো। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সৈন্যগণ ধ্বংস ও লুটের কাজে লিপ্ত রইলো আর এদিকে রাজ্যের অভ্যন্তরে শাসকগণ ভোগবিলাসী ফ্যান্টাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া (রাঃ) যখন হজরত উসমানকে (রাঃ) আর্মানিয়া আক্রমন করতে পরামর্শ দেন, প্রায় একই সময়ে মিশরের আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) ত্রীপলি আক্রমন করতে চেয়েছিলেন। আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) সাথে ক্ষমতার দ্বন্ধ ও দেশের আভ্যন্তরীন গোলযোগে তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো অনেকদিন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) ৬৫২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ত্রীপলি আক্রমন করার প্রস্তুতি নেন এবং উসমানকে (রাঃ) সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ জানান। উসমান (রাঃ) মদীনা থেকে একদল বিশেষ যোদ্ধা ত্রীপলিভিমুখে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী। এক পর্যায়ে রণভঙ্গ দিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ যখন পশ্চাদ গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মদীনা থেকে আগত তেজস্বী বীর কোরায়েশ যোদ্ধা হজরত জোবায়ের (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) একটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তিনি বল্লেন- মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষনা করা হউক, যে ব্যক্তি ত্রীপলির গভর্ণর গ্রিগেরিয়াসের মাথা কেটে আনতে পারবে, তাঁকে এক লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা ও সেই সাথে গ্রিগেরিয়াসের সুন্দরী যুবতী কন্যা দান করা হবে। যেই ঘোষনা সেই কাজ। কিছু দিনের মধ্যেই গ্রিগেরিয়াসের মাথাটা দ্বিখন্ডিত করে সেনা-শিবিরে হাজির করা হলো। সাথে বন্দিনী সেই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী গ্রিগেরিয়াসের বীর কন্যা, যিনি অস্ত্র হাতে সব সময় পিতার পাশে পাশে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। এক লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা পুরুস্কার বন্টনে মুসলিম সেনাপতির কোন অসুবিধা হয়নি, সমস্যাটা হলো সেই মেয়েকে নিয়ে। একটি মাত্র মেয়ের দিকে হা- করে তৃষ্ণার্থ চোখে তাঁকিয়ে আছে এক পাল কাম-ক্ষুধার্থ সৈন্য। মহিলা নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। ঐতিহাসিক মুয়রের মতে, গ্রিগেরিয়াসের বীর কন্যা, পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুকেই সেচ্ছায় বরণ করে নেন। কোন মুসলিম সৈন্যের শয্যা সঙ্গিনী হওয়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

ত্রীপলি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী, যে বিপুল ধন-রত্ন লাভ করেন, তা দেখে খলিফা উসমান (রাঃ) খুশিতে আত্মহারা হয়ে, বিজয়ী বীর-নেতা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে (রাঃ) বীর-উত্তম উপাধীতে ভুষিত করেন। ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে এত সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি। নিয়মানুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব খাতে জমা হওয়ার কথা। প্রফুল্লতায় বিভোর উসমান (রাঃ) এই বিপুল সম্পদের প্রায় সবটুকুই আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে ও তাঁর নিজস্ব মন্ত্রী মারওয়ানকে দিয়ে দেন। তবে এ ছাড়া খলিফার কোন উপায়ও ছিল না। বাইতুলমাল শুন্য রাষ্ট্র-পরিচলনায় যখন উসমান (রাঃ) হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন আর্মানিয়া ও ত্রীপলি যুদ্ধই তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র সহায় ছিল। তাই খলিফা নিজেই ত্রীপলির যুদ্ধ-পূর্বে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দকে, যুদ্ধে জয়ী হলে এরূপ সম্পদ বন্টনের অঙ্গীকার করেছিলেন। বিষয়টা জনগন প্রসন্ন-চিত্তে মেনে নিতে পারলো না।

উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ও মারওয়ান এরা দু-জনই ছিলেন উমাইয়া বংশীয় এবং হজরত উসমানের (রাঃ) আত্মীয়।

ত্রীপলি জয় করে মুসলিম সৈন্যদল আলজিরিয়া ও মরক্কো দখল করে নেয়। এবার মরক্কোর উত্তরে সমুদ্রের অপর পাড়ে ফুলে ফলে ভরা শস্য-শ্যামলা তরু-রাজী আচ্ছাদিত, লোভনীয় স্পেইন ভুমির ওপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। সংবাদ পেয়ে খলিফা লোভ সামলাতে পারলেন না। তড়িঘড়ি করে মদীনা থেকে একদল সৈন্য সহ আব্দুল্লাহ্ বিন না'ফে বিন হাসিন ও আব্দুল্লাহ্ বিন না'ফে বিন আবদে কায়েস নামক দুইজন পরাক্রমশালী যোদ্ধাকে স্পেইন অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। কোরায়েশ মরু-দস্যুরা তখনো জল-দস্যুতার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সমুদ্র-পাড়ে এসে তারা স্পেইন দখলের আশা আপাতত ত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ যখন সাইপ্রাস উপকুলে জল-যুদ্ধে ব্যস্ত, হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তখন স্থল-যুদ্ধে কনষ্টানটাইন দখল করতে বেবিয়ে পড়েন। কনষ্টানটাইন দখল করতে মুয়াবিয়া (রাঃ) দুইবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু ঐ বৎসরই তিনি আর্জরুম প্রদেশের অন্তর্গত হাস আল্-মুরাত নামক এলাকাটি দখল করতে সক্ষম হন।

খলিফা উসমানের শাসনামলে মুসলিম সাম্রজ্যের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা কেমন ছিল তা জানার লক্ষ্যে এবারে কুফা ও বসোরার প্রতি একটু নজর দেয়া যাক। হজরত ওমরের (রাঃ) আমলে কুফার গভর্ণর ছিলেন হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। খলিফা ওমর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে একটি মহৎ কাজ করে গেলেন। সরকারী সম্পদের অপচয়কারী, চরম অমিতব্যয়ী মাত্রাতিরিক্ত সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবী হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) কুফার গভর্ণরপদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে হজরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রাঃ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভাগা সাধারণ কুফাবাসীর দুর্গতি দূর হলোনা। হজরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) অত্যন্ত রুক্ষ-কঠোর ঔদ্ধত্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বৈষম্যমুলক অশ্লীল আচরণ, ব্যক্তি কেন্দ্রীক চরিত্র ও জনগনের প্রতি চরম অবজ্ঞার খবর উসমানের (রাঃ) কানে পৌছিলে তিনি অতীষ্ঠ হয়ে মুগীরা ইবনে শো'বাকে (রাঃ) গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু জনগনকে হতাশ করে হজরত উসমান (রাঃ) আবার সেই সুখ-সম্ভোগ বিলাসী সাহাবী হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রাঃ) উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। হজরত সা'দ (রাঃ) পূর্বের চেয়েও অধিক বিলাসী হয়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, এবারে তিনি বাইতুল-মাল থেকে বিপুল পরিমানের সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে বসলেন। তখন বাইতুল-মালের কোষাধক্ষ্য ছিলেন সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)। উল্লেখ্য বর্তমান কুফার গভর্ণর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ইসলাম-পূর্ব মক্কায় ছিলেন, আকাবা ইবনে আবু মুইতের ছাগল রাখাল। বাইতুল-মালের অর্থ নিয়ে গভর্ণর ও কোষাধক্ষ্যের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য ও ঝগড়া হলো। একে অন্যের প্রতি গালাগালি, রূঢ় ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌছিল যে শেষ পর্যন্ত গভর্ণরের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ, খলিফা উসমানের (রাঃ) দরবারে উপস্থাপিত করা হলো। বিচারে হজরত সা'দ (রাঃ) দোষী সাব্যস্থ হলেন।

এবারে কুফার গভর্ণর পদে যিনি নিযুক্ত হলেন, তিনি হলেন খলিফা উসমানের (রাঃ) বৈপিত্রীয় ভাই, খ্যাতনামা বীর অলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)। আগুন ধরে গেল কোরায়েশ-হাশিমী গোত্রের গায়ে। কুফার নব-নিযুক্ত শাসন কর্তা অলিদ ছিলেন নবীজী মোহাম্মদের (দঃ) প্রানের শত্রু ওকবার পুত্র। নবীজীর সাথে ওকবার একটি ঘঠনা কুফাবাসীর জানা ছিল। এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের হাতে ওকবা বন্দী হয়ে ঘৃনা ও তাচ্ছিল্য ভরা সুরে নবীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তিনি (ওকবা) মারা গেলে তাঁর সন্তানগণ কি খাবে? উত্তরে নবীজী বলেছিলেন- দোজখের আগুন খাবে। সেই ওকবার ছেলে অলিদকে, অসৎ চরিত্রের লোক হিসেবে মানুষ আগে থেকেই জানতো। ক্রোধে, ঘৃণায় কুফাবাসী বারবার খলিফা উসমানের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল পেলো না। অলিদের কঠোর দমন নীতির সামনে সাধারণ মানুষ মাথানত করতে বাধ্য হলো। অন্যায়, অত্যাচার আর সেচ্ছাচারিতার চুড়ান্ত সীমায় এসে অলিদ (রাঃ) একদিন জনতার ফাঁদে ধরা পড়ে যান। মদ্যপানে অভ্যস্থ, হজরত অলিদ (রাঃ) নেশা-গ্রস্থ হয়ে একদিন এমন ভাবে ঘুমিয়েছিলেন যে, কিছু লোক তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে রাষ্ট্রীয় সীলযুক্ত একটি আংটি খুলে, অসংযত চরিত্রের প্রমান স্বরূপ, মদীনায় খলিফার কাছে নিয়ে যায়। তা ছাড়া তিনি একদিন নেশায় বিভোর হয়ে মসজিদে ইমামতির সময়ে ফজরের নামাজ, ফরজ দুই রাকাতের যায়গায় চার রাকাত পড়ায়েছেন বলেও তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করে। এ নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভ ঠেকাতে খলিফা বাধ্য হয়ে হজরত অলিদকে পদচ্যুত করেন। এর পর থেকে অলিদ (রাঃ) আর কোনদিন হজরত উসমানকে (রাঃ) সুনজরে দেখেন নি। এবার খলিফা কুফার মসনদে বসালেন কোরায়েশ বংশের তরুণ বীর যোদ্ধা সাইদ বিন আল্ আ'সকে। এই ব্যক্তির ভেতর কোরায়েশ সুলভ অমানবিক, দুষ্চরিত্রের অভাব মোঠেই ছিল না। কোরায়েশদের ঔদ্ধত্য, অহমিকা কুফাবাসীর জানা ছিল। আগের সকল শাসকের চেয়ে নতুন গভর্ণর ভয়ানক রূপে প্রকাশ হলেন। তিনি স্থানীয় অমুসলিমতো দূরের কথা, অ-কোরায়েশ মুসলিমদেরকেও হীন মর্যাদার, পশু পকৃতির বলে খলিফাকে পত্র দ্বারা অবহিত করলেন এবং বল্লেন, এদেরকে তিনি লৌহ-দন্ড দিয়ে শায়েস্তা করবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষনা দিলেন, একমাত্র কোরায়েশ বংশই সম্ভ্রান্ত, শালীন ও উচ্চমর্যাদার দাবী করতে পারে। একটি বৈঠকে সাইদ বিন আল্ আ'স যখন বল্লেন- সোয়াদ উপত্যকাটি একচেটিয়া কোরায়েশ বংশের লোকদের জন্য রক্ষিত, উপস্থিত জনগণ সমসুরে প্রতিবাদ করে উঠলো। তারা বল্লো- এই বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে কুফা ও বসোরাবাসীর অবদান ভুলে গেলে কোরায়েশদের ভালো হবে না। সারা দেশ জুড়ে গণ-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। মদীনায়, মিশরে, কুফায় সর্বত্র সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুই উমাইয়া বংশের লোক। যে হাশিমী বংশে মুহাম্মদের (দঃ) জন্ম, যাঁর জন্ম না হলে ইসলাম জন্ম নিতোনা, সেই হাশিমী গোত্র এমন আস্ফালন বরতদাশ্ত করবে কেন? তারা খলিফার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিতে থাকলো। এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রাঃ) কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। ইত্যবসরে বসোরার একটু খোঁজ নেয়া যাক।

ইসলামের ইতিহাসের দুই বিশেষ ব্যক্তিত্ব হজরত হাসান বসরী (রাঃ), ও হজরত রাবেয়া বসরীর (রাঃ) জন্মস্থান এই বসোরা। মুক্ত-বুদ্ধি চর্চার মু'তাজিলা মতবাদও

এই বসোরা হতে উদ্ভূত। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কুফার পরেই বসোরার স্থান। কুফা ইরাকের উত্তরাঞ্চলের ও বসোরা দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল। বসোরার শাসনকর্তা এখান থেকে দক্ষিন পারস্য, বেলুচিস্থান ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত শাসন চালাতেন। কুয়েতের দক্ষিনাঞ্চলও বসোরার শাসনাধীন ছিল। হিজরী ২৪ সনে হজরত ওমর (রাঃ) সাহাবী হজরত আবু মুসা-আশআরীকে (রাঃ) বসোরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। একনাগাড়ে বহুদিন অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) হয়ে উঠেন এক ভয়ানক আত্মম্ভরী স্বৈর-শাসক। একটি এলাকা দখলের প্রস্তুতিকল্পে আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) মসজিদে জিহাদের ফজিলত বর্ণনাকালে বলেছিলেন যে, পায়ে হেঁটে জিহাদের ময়দানে গেলে প্রচুর সোয়াব অর্জন করা যায়। লোকে বল্লো- তাঁর কথায় মিথ্যাচার আর হঠকারিতা আছে। পরদিন ভোর বেলা অবাক বিস্ময়ে সাধারণ জেহাদীগন প্রত্যক্ষ করলো, গভর্ণর আবু মুসা-আশআরী (রাঃ) রাজকীয় পোষাকে তাজী ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। চল্লিশটি গাধা তাঁর যুদ্ধ-সরঞ্জাম বহন করছে। কিছু লোক তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালো। আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ঐ লোকদিগকে নীচ, হীনমনা, বদজাত বলে ধমকালেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিলেন। পূর্বে তাঁর অসীম ক্ষমতার অহমিকা ও সেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে জনগন বিদ্রোহ করে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। আবু মুসা (রাঃ) তাঁর আত্মীয়জনদেরকে অত্যাধিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্রকে, সুবিধা প্রাপ্ত ও সুবিধা বঞ্চিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেন। সুবিধা-বঞ্চিতদল সংগঠিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মদীনা পর্যন্ত তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। একটি নিশ্চিত গৃহ-যুদ্ধের লক্ষণ টের পেয়ে খলিফা উসমান (রাঃ) হিজরী ২৯ সনে, আবু মুসা-আশআরীকে (রাঃ) গভর্ণরপদ থেকে বরখাস্ত করেন। গৃহ-যুদ্ধ ঠেকানো গেল কিন্তু বসোরা বাসীর দুঃখ দূর হলোনা। এবারে বসোরার ক্ষমতায় বসলেন, খলিফা উসমানের (রাঃ) মামাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমীর। এই লোকটি খালিদ বিন ওলিদ ও আমর ইবনুল আ'সের চেয়ে ও ভয়ংকর দুর্ধর্ষ ছিলেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অ-কোরায়েশদের অধিকার নিষিদ্ধ করে দেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমীর ভীষন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর অমানবিক কঠোর শাসন-নীতি মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কোরায়েশ বনাম অ-কোরায়েশ। এক দিকে যেমন খলিফা উসমানের (রাঃ) রাজ্য বিস্তার, বিভিন্ন দেশ, এলাকা দখল ও দখলকৃত এলাকায় বিদ্রোহ দমনকার্য চলতে থাকলো, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে, হজরত উসমানের ক্ষমতাসীন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের (দঃ) হাশিমী বংশ, আরবদের বিরুদ্ধে অনারব, কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অ-কোরায়েশ, শোসকের বিরুদ্ধে শোসিতের বেঁচে থাকার সংগ্রাম অব্যাহত রইলো।

চলবে-